আল কুরআন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিযক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছে?

(সূরা ফাতির : ৩)

হাদিস

লোকের সাথে নম্র ব্যবহার করিও, কঠোর হইও না; নিন্দা করিও না। বহু 'কিতাবী লোক মিলিবে যাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিবে, 'বেহেশতের চাবি কি?' উত্তর দিও উহা (বেহেশতের চাবি) আল্লাহর সত্যতায় সাক্ষ্য ও সৎকর্ম সম্পাদন।

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী' থেকে।]

Chief Editor: Barrister Ahmed A Malik

Editor: Sheikh Mozzammel Hossain
Assistant Editor: Muhammad Subhan

News Editor: Mohammad Koyes Ali

Published by: SNS Media (UK) Ltd
117 Whitechapel Road, London E1 1DT

Tel: 0870 3606607/020 7422 0006
Fax: 08717 143614
info@weeklybangladesh.com
www.weeklybangladesh.com

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
Weekly Bangladesh

সম্পাদকীয়

ইরাকে দখলদারিত্বের অবসান শুরু

দখলদারিত্ব অবসানের অংশ হিসেবে ইরাকের রাজধানীসহ বিভিন্ন শহর থেকে বিদায় নিয়েছে মার্কিন সৈন্যরা।

রাজধানী বাগদাদসহ অন্যান্য শহরের নিরাপত্তার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ইরাকী বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরি আল মালিকি সেনা প্রত্যাহারকে টার্নিং পয়েন্ট বলে বর্ণনা করেছেন। ইরাকী সরকার এ দিনটিকে 'জাতীয় সার্বভৌম' দিবস হিসেবে উল্লেখ করে ছুটি ঘোষণা করেছে। মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে বাগদাদে রীতিমতো উৎসব শুরু করেছে ইরাকীরা। এদিকে ইরাকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার হিল বলেছেন, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরের আগে মার্কিন সেনা সংখ্যায় কোন বড় ধরনের হ্রাস হবে না। তবে সেনা প্রত্যাহার একটি মাইল স্টোন। তিনি আরো বলেছেন, ৩০ জুনের পর যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধরত সেনারা শহর ও গ্রামগুলো ছেড়ে গেলেও তারা ইরাকেই থাকবে। মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কে সাধারণ ইরাকীদের প্রতিক্রিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বার্তা সংস্থাসমূহের খবরে বলা হয়েছে, আমেরিকান বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য প্রত্যেক ইরাকী এতদিন অপেক্ষা করছিল।

অসত্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মূলত প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ২০০৩ সালের মার্চে বিমান হামলার মধ্য দিয়ে ইরাকে আগ্রাসন শুরু করে ২০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ৩৪টি দেশ এই যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিলেও প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই ইরাকে প্রতিরোধের নতুন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই যুদ্ধে ৪ হাজার ৩ শ' ২১ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। গত ছয় বছরে দখলদাররা লক্ষাধিক ইরাকীকে হত্যা করেছে। প্রায় ২৫ হাজার ইরাকী পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে গিয়েছে। ঘর-বাড়ী হারিয়ে নিজ দেশেই উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় ২০ লাখ ইরাকী। প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয়ে প্রহসনের বিচারে বীরের বেশে ফাঁসিতে শাহাদাৎ বরণ করেছেন ইরাকের অবিসংবাদী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। তার দুই পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে। স্বাধীনতা রক্ষায় অকুতোভয় হাজার হাজার ইরাকীকে জেলখানায় হত্যা ও নির্যাতন করা হয়েছে। মানবতার ধ্বজাধারীদের দ্বারা আবুগারীব কারাগারে বর্বর নির্যাতনের ভয়াবহ ও নৃশংস চিত্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। গণতন্ত্র রফতানী ও পুনর্গঠনের নামে হাজার হাজার বছরের পুরনো ইরাকী সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়া হয়েছে। সুপ্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার নির্দশনসমূহ চুরি করে নিয়ে গেছে মার্কিন সৈন্যরা। মোট কথা, গত ছয় বছরের অধিককালে দখলদার বাহিনী ইরাকের স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সকল অবকাঠামোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইরাক যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়েই শুরু হয়েছে বিশ্বমন্দা।

সংবাদ ভাষ্য

পেছনের দিকে ফেরা

মশিউল আলম

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একটা কথা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল : আমরা আর ১১ জানুয়ারির আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই না। সাধারণ মানুষের মনোভাব এ রকমই ছিল। রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মনের কথা জানি না; তবে প্রকাশ্যে তাদেরও একটা বড় অংশকে এই মতের পক্ষে কথাবার্তা বলতে শোনা গেছে। অন্ততপক্ষে লাগামহীন দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থার চূড়ান্ত দলীয়করণ, দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুশীলনের অভাব, এক-ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন অনেকেই। আর যারা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তারা এ রকম একটা সংকল্পই মোটামুটি ব্যক্ত করেছিলেন যে বাংলাদেশকে আর কখনো ১১ জানুয়ারির আগের অবস্থায় ফিরে যেতে দেওয়া চলবে না। সেই লক্ষ্যে তারা প্রাতিষ্ঠানিক নানা সংস্কারসহ অনেক প্রক্রিয়ার সূচনা করেছিলেন। রাজনৈতিক শক্তিগুলোর তরফ থেকে সেসব সংস্কারের বিরোধিতা অন্তত প্রকাশ্যে করা হয়নি। আওয়ামী লীগ বরং এ রকম কথা বলেছিল যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজকর্মের বৈধতা দেবে, তাদের সূচিত সব সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে, এগিয়ে নেবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তার সক্রিয় সহযোগী সশস্ত্র বাহিনী, বিদেশি দাতা সংস্থাগুলো, বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মহলগুলো প্রবলভাবে চাইছিল, যেন সূচিত সব সংস্কার প্রক্রিয়া ভবিষ্যতের নির্বাচিত সরকারের সময় স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও অব্যাহত থাকে। লাইনচ্যুত গণতন্ত্রকে সঠিক রাস্তায় তুলে দেওয়া বলে যে কথাটা তখন বলা হয়েছিল, এর মর্ম ছিল আসলে এটাই : ১১ জানুয়ারির আগের পথ নয়, এর পরে বাংলাদেশ যে পথে যাত্রা শুরু করেছে, সেটাকে এ দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো যেন সঠিক পথ বলে মেনে নিয়ে সেই পথেই এগিয়ে যায়। যেন উল্টোদিকে ঘুরে পেছনের দিকে আবার যাত্রা শুরু না করে।

কিন্তু নির্বাচনের পরপরই উল্টোদিকে ঘুরে আবার সেই পেছনের পথে রওনা করার সব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর এই ছয় মাসের মাথায় মনে হচ্ছে, যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের সবকিছু বানচাল হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের নেতা-কর্মীরা নিজ নিজ স্বভাব ফিরে পেয়ে স্ব স্ব মূর্তিতে আবির্ভূত হচ্ছেন। ক্ষমতার ভেতরে বা বাইরে কোথাও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের কথায় বা আচরণে এমন মনোভাবের আভাস নেই যে তারা অতীতে ভুল বা অন্যায় কিছু করছেন, যা শোধরানো দরকার।

বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং এসবকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দল ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে খুনোখুনির ঘটনাগুলো ১১ জানুয়ারির আগের গণতান্ত্রিক শাসনপর্বের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। নিয়োগ-বদলি বাণিজ্যের পাশাপাশি জনপ্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে সেই পুরোনো পন্থায়, যাতে রাজনৈতিক আনুগত্যের বিবেচনাই সর্বোচ্চ বিবেচনা। দুর্নীতি দমনের অভিযান বন্ধ হয়েছে। বিদায় নিতে হয়েছে দুদকের চেয়ারম্যান হাসান মশহুদ চৌধুরীকে। দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকদের এই সরকার যে ভীষণ পছন্দ করে, তার একটা প্রমাণ মিলেছে এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে। অবশ্য পরে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে দুর্নীতিবাজদের সুযোগ কিছুটা কমানো হয়েছে। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ তিন বছর থেকে কমিয়ে এক বছরের জন্য করা হয়েছে। কিন্তু সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, দুর্নীতি যে একটা অনৈতিক ব্যাপার এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তযোগ্য অপরাধ- সেটাই বিশ্বাস করেন না এই সরকারের নেতৃবৃন্দ। অথবা বিশ্বাস করলেও দুর্নীতির সঙ্গে আপস করে চলাটাই যেন এই জাতির স্বাভাবিক জীবন-বাস্তবতা।

দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি, কর ফাঁকিসহ নানা অপরাধের অভিযোগে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল, যারা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, এমনকি যারা নিম্ন আদালতের রায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন, এখন তারা সবাই বলছেন, তারা কোনো অন্যায়-অপরাধ করেননি, তাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। সাড়ে চার হাজার মামলার আসামি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুরো মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে, সরকারি দলের আরও অনেক নেতার মামলাও তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি যারা দণ্ডিত হয়েছেন, তাদের দন্ড মওকুফ করে অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য খোদ রাষ্ট্রপতির অনুকম্পা প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে খবর বেরিয়েছে। যদি আইনের শাসনের প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে মামলা তুলে নেওয়ার এমন হিড়িক পড়ত না, অভিযোগগুলো সত্য না মিথ্যা তা নির্ধারিত হতো আদালতেই। শেখ হাসিনা, যিনি বিপুল ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন, তিনি যদি স্বাধীন বিচারব্যবস্থা ও আইনের শাসনের প্রতি আহবান হতেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে না দিয়ে নিজেই বলতেন, ঠিক আছে, আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগে মামলা হয়েছে, সেগুলো সত্য না মিথ্যা তা আদালতেই নির্ধারিত হোক। তিনি যদি তা করতেন, তাহলে আইনের শাসনের প্রতি একজন রাজনৈতিক নেত্রীর, একজন প্রধানমন্ত্রীর আস্থা ও অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতো।

উভয় দলের রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা নিজেদের নিষ্পাপ-নির্দোষ বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তারা এবার বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও তার সহযোগী সশস্ত্র বাহিনীর তৎকালীন নেতৃত্বকেও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করছেন। সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ, সাবেক সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদসহ তার সরকারের উপদেষ্টাদের কারও কারও বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তাদের বিচারের দাবি জানানো হচ্ছে। মোরশেদ খান থেকে মুরু করে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পর্যন্ত অনেক নেতা অভিযোগ করেছেন, ব্যবসায়ীদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে কোটি কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে। সরকারি দলের নেতা-নেত্রীদের মুখে এ ধরনের কথাবার্তা বেড়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একবার নিজের দলের নেতা-নেত্রীদের উদ্দেশে বললেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনায় বিরোধী দলের লোকদের সঙ্গে গলা মেলানোর দরকার নাই। কিন্তু এতে খুব ফল হলো না। সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উচ্চারিত হলো সংসদে সরকারি দলের উপনেতা আওয়ামী লীগের নেত্রী সাজেদা চৌধুরীর মুখে। তিনি বললেন, উপকারাগারে শেখ হাসিনার খাবারে বিশ মেশানো হয়েছিল। তার দেখাদেখি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মোশাররফ হোসেন বললেন, উপকারাগারে খালেদা জিয়ার খাবারেও বিষ মেশানো হয়ে থাকতে পারে। এগুলোর পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কুশীলব, তাদের যারা সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যারা সংস্কারের পক্ষে কথা বলেছিলেন, তাদের নিয়ে কয়েকটি সংবাদপত্রে বেশ রসাল, চাঞ্চল্যকর, বিষোদগারপূর্ণ লেখালেখি চলছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সমালোচনা অবশ্যই করা যায়, তাদেরও অনেক ভুলত্রুটি হয়েছে। এমনকি তাদের আমলে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়নি, এমন কথা বলা যায় না। বরং হওয়ার সমূহ সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল, কারণ ওই সরকারের জবাবদিহির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের হাতে ক্ষমতা ছিল নিরঙ্কুশ, তাদের পাশে সহযোগী হিসেবে ছিল সশস্ত্র বাহিনী, যার সদস্যদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সাধারণত দেখা যায় না। এ ছাড়া তাদের ক্ষমতা গ্রহণ, রাজনৈতিক শুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে দুই নেত্রীকে বাদ দেওয়ার উদযোগ, জরুরি অবস্থার মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ দেওয়া, বড় দুটি দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের এখতিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু শুধু এসব প্রশ্ন ধরেই তাদের বিষোদগার করে বাস্তবিকভাবে কোনো সুফল মিলবে না। বরং প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক যেসব সংস্কারের সূচনা তারা করেছিলেন, বিশেষ গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে দলের ভেতর গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুশীলনের সূচনা করা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, দলীয়করণ থেকে জনপ্রশাসনকে মুক্ত করা-এই সব পদক্ষেপকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে অব্যাহত রাখার উদযোগ নিলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

আনুডুয়িং ওয়ান-ইলেভেন-১১ জানুয়ারিকে উল্টে দেওয়া, এর আগের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ফিরে যাওয়ার অর্থ হবে ভবিষ্যতে আরও অনেক ১১ জানুয়ারির সম্ভাবনাকে জিইয়ে রাখা। আওয়ামী লীগ মাত্র ছয় মাসের মাথায় বলা শুরু করেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা তুলে দেওয়া দরকার। এর মানে, এখনই তাদের মাথায় এসেছে, আগামী নির্বাচনে আবার জিততে হলে কী করতে হবে। বিএনপিও একই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনে নিজেদের বশংবদ লোককে বসিয়েছিল, এবং তাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদ দখল করে বসেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো সুফর যে ফলেনি, তা শুদু বিএনপিই দেখেনি, আওয়ামী লীগও দেখেছে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে বিএনপি ওই নিষ্ফল কাজটি করেছিল, নিষ্ফল জেনেই আওয়ামী লীগ হয়তো তার পুনরাবৃত্তি করবে না। তারা বরং খোদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাটিই বাতিল করে পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের পুনর্বিজয় নিশ্চিত করার কথা ভাবতে পারে। সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা সেটা করতেই পারে। কিন্তু করলে তা কি বিএনপিসহ অন্য বিরোধী দলগুলো মেনে নেবে? তারা কি নির্বাচনে অংশ নেবে? বরং নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য তারা কি লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তায় নামবে না? তাহলে কি আমাদের মনে পড়বে না ২০০৬ সালের অক্টোবর ও তার আগে-পরের রক্তক্ষয়ী দিনগুলোর কথা? মনে কি পড়বে না ১১ জানুয়ারির কথা, যখন সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকারগুলো বিসর্জন দিয়েও বাংলাদেশের মানুষ হাঁপ ছেড়ে বলেছিল : বাঁচা গেল!

তাহলে আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের রাস্তাটা কি সোজা বা এমনকি আঁকাবাঁকা হয়েও সামনের দিকে এগোবে না? রাস্তাটা কি একেবারেই বৃত্তের মতো চক্রাকার? এই চক্রেই আমরা ঘুরতে থাকব? দশকের পর দশক?

মশিউল আলম : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।